মোবা: নং -০১৭১৩৭৪১৬৮৬
ই-মেইল -debesh00007@gmail.com

নতুন প্রজন্মের কাছে এক মুক্তিযোদ্ধার খোলা চিঠি

প্রিয় প্রজন্ম,

রতন কান্দি
২৩ পৌষ'১৪৩২
৭ জানুয়ারী'২০২৬

তোমরা আমার ভালবাসা নিও। তোমরা লেখাপড়া কর, মানুষের মতো মানুষ হও। তোমরা সৎ ও দেশ প্রেমিক হও। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের পর মহান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির বিভিন্ন গৌরবময় অর্জন গুলির মধ্যে অন্যতম। ২৩/০৬/১৭৫৭ তারিখে মীর্জাফরদের ষড়যন্ত্রে নবাব সিরাজ দ্দৌলার পরাজয় হয়। তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। পলাশীর আম্র কাননে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। ইহার পর নানা অত্যাচার নিপীড়ন ও জীবন দানেরপর ১৪/০৮/১৯৪৭ তারিখ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তোমরা লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ সুবিধা মত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়বে। তাহলে বাঙালিদের বীরত্ব গাঁথা ও অন্যান্য জানতে পারবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্বে ব্রিটিশরা ১৯০' বছর ১ মাস ২১ দিন ভারতবর্ষকে শাসণ শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে স্বাধীণতার জন্য শত শত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, জেল খেটেছেন, দ্বীপান্তরে গিয়াছেন। যে দুইটি অঞ্চলে মুসলমান বেশী সে রকম দুটি অঞ্চল কে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি অংশ দুই জায়গা। এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং আমাদের বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখন্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। মাঝ খানে ১৬০০ কিলোমিটারে অধিক দূরত্ব এবং তিন দিকে ভারত রাষ্ট্রের অবস্থান। শুধু ১৬০০ কিলোমিটারের অধিক দূরত্ব তা নয়, মানুষ গুলোর ভিতড়ে ছিল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি ঐতিহ্য সব কিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ গুলোর মাঝে মিল ছিল সেটি হচ্ছে "ইসলাম ধর্ম"। আমরা ব্রিটিশদের শাসন শোষনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট। আমাদের এই সোনার বাংলাটি ছিল ভারতবর্ষের একটি ভূখন্ড। ১৯৪৭ সালে সংখ্যাগড়িষ্ট মুসলমান দুইটি এলাকা মিলে পাকিস্তান। সংখ্যাগড়িষ্ট হিন্দু অধিবাসীদের নিয়ে হিন্দুস্থান বা ভারত। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম ছিল দুইটি ভূখন্ডের অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম। ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি প্রদেশ ছিল। আমাদের অংশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে শাসণ করতো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক। তারা শাসনের নামে পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিদের বঞ্চিত, শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন করতো। তারা আমাদের ন্যায্য অধিকার দিত না। চাকরি ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের কে বঞ্চিত করত। তদানীন্তন বাঙালি নেতাগণ তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা করতো। অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড় নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের উপর নিপীড়ন। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠি ঠিক সেটিই শুরু করে ছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কালীন নেতা ও জাতির পিতা কায়েদ-এ-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন- "উর্দূ হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।"

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ১৯৫২ সালে উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু বাঙালিদের আন্দোলনের কারনে পারে নাই। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী অবাঙালি পাকিস্তানি শাসকের নির্দেশে পুলিশ বাঙালি ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চালায়। বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য সালাম, রফিক, শফিক, বরকত ও জব্বার সহ অনেক বাঙালি শহীদ হয়েছেন। যেখানে আমাদের ভাষা শহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন সেখানে এবং প্রতিকী হিসাবে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের প্রিয় শহীদ মিনার। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদদের স্মরণে আমরা শহীদ দিবস পালন করতাম। বর্তমানে আমাদের শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমরা সহ পৃথিবীর সব মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে ২১ ফেব্রুয়ারী আমাদের ভাষা শহীদ দিবস সারা পৃথিবী ব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করি। শহীদ মিনার বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মারক। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে পূর্ব বাংলার যে কয়েক জন বরেন্য নেতৃত্বের নাম স্মরণ যোগ্য তাঁরা হলেন- শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ,হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর হতে বিভিন্ন বাঙালি নেতার আন্দোলন সংগ্রামের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৫৯-৬১ সালে ছাত্র সমাজের হাত ধরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের নিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়ার্স গঠন, ৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন, ৬৮ সালে আগরতলা মামলা, ৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান প্রভৃতি আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ১২ নভেম্বর'৭০ দক্ষিণ অঞ্চলের উপকুলে প্রলংকরী ঘূর্ণিঝাড় ও জলোশ্বাস হয়েছিল। এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোশ্বাসে প্রায় ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে ছিলেন। আরো অনেক ক্ষতি হয়েছিল। বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামের কারণে জাতির পিতাকে প্রায় ১৩ বছর কারা ভোগ সহ বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতন সইতে হয়েছে। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ টি আসনের ১৬০টিতে গণ ভোটে বিজয়ী হয় তৎকালীন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সংরক্ষিত আরো ৭টি মহিলা আসনের অধিকারী হয়। মোট ১৬৭টি জাতীয় পরিষদের আসনের অধিকারী হয়ে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৭ ডিসেম্বর'৭০ প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসণে বিজয়ী হয়েছিল। যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলেন। প্রায় দীর্ঘ ১৩টি বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। বিভিন্ন অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তাঁর ত্যাগ, আন্দোলন ও সংগ্রামের বিজয় হলো। জনগন স্বতঃফুর্তভাবে জাতির পিতাকে ম্যান্ডেট দিয়ে ছিল। তখন দেশের শাসক ছিলেন সামরিক প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। বাঙালিদের বিজয়ে বিহারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ভুট্টো ও অন্যান্যদের সাথে নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের পরিকল্পনা করলেন। ২২ ফেব্রুয়ারী'৭১ পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলদের এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপন নির্দেশ দিলেন,"৩ মিলিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও তাদের সমর্থকদের হত্যা করুণ। তাহলে বাকিরা আমাদের বস্যতা স্বীকার করবে"। তাঁর ধরণা ছিল নির্যাতন করে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যা করলেই আন্দোলন থেমে যাবে'। কালক্ষেপন করে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী'৭১ ইয়াহিয়া খান মিথ্যা আশ্বাস দিলেন ৩ মার্চ'৭১ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। ১৬

ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধুকে পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচন করা হয়। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ১.০৫ মি: জাতির উদ্দেশে দেওয়া বেতার ভাষণে ৩ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বে-আইনী ভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। বেতার ভাষন শুনে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। ২ মার্চ ছাত্র লীগের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটমুলে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। সারা দেশের মানুষ বাঁশের লাঠি, কাঠের বৈঠা ও অন্যান্য দেশী অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমে এলেন। পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ৩মার্চ কে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের নির্দেশ দিলেন। জাতির পিতার নির্দেশে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩-৬ সারাদেশ ব্যাপী সকাল ৬ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্বতঃফুর্ত হরতাল পালন করা হলো। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের- "আমার সোনার বাংলা..." গানটি নির্বাচিত হলো। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ও জাতির পিতা/জনক ঘোষণা দেওয়া হল। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বললেন- "...আজ হতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হলো। ৫৮ হাজার ৫০৬ বর্গমাইল ভৌগলিক এলাকার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাস ভূমির স্বাধীন সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম হবে বাংলাদেশ।" বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ানো হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্র তদানিন্তন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বুঝতে পারলেন। তিনি ৭ মার্চ'৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে) বিকাল ৩-২০ মি: থেকে শুরু করে ১৮-৩৫ সেকেন্ডের এক ঐতিহাসিক ভাষণে বললেন- "প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লগি ে র নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরে ছিলেন যে যেকোন সময় সামরিক জান্তা তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে। তাই তিনি পরবর্তী করণীয় সর্ম্পকেও দিক নিদের্শনা দিলেন। ৭ই মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধুকে বিছিন্নতা বাদি হিসাবে চিহ্নিত করতো। উক্ত সভায় ৫ লক্ষাধিক জন সমাবেশ ঘটে ছিল। স্বাধীনতা ঘোষনা দিলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এক যোগে সভায় উপস্থিত সবাই কে হত্যা করতে পারে। তাই তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষনা দিলেন না। পরোক্ষ ভাবে স্বাধীনতা ঘোষনা দিলেন। তিনি বললেন " যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।" সকল বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনার কথা বুঝতে পারলেন। ৬ মার্চ'৭১ বাঙালিদের আন্দোলন সংগ্রাম স্তব্ধ ও নির্যাতনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি নিষ্ঠুরতম বেলুচি পাকিস্তানি সেনা লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক বাহিনী প্রধান করে পাঠালেন। ১৪ মার্চ'৭১ বঙ্গবন্ধু ৩৫টি নির্দেশ দিলেন। তিনি স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্ট কালে জন্য বন্ধ রাখতে বললেন। ১৫ মার্চ নতুন কুট কর্ম-কৌশল নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে কাল ক্ষেপন ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের প্রস্তুতি মূলক কার্যাদি করার জন্য সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রহসন মূলক আলোচনা শুরু করেন। গোপনে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলা বারুদ আনতে থাকেন। ২১ মার্চ'৭১ পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগড়িষ্ট সাধারণ পরিষদ আসনে বিজয়ী পিপলস পাটি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো তার ১২ জন উপদেষ্টাসহ আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য এলেন। ২৫ মার্চ পৌঁনে ৬টায় আলোচনা অসমাপ্ত রেখে বিকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গোপণে বিশেষ বিমান যোগে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেলেন। যাবার পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কাখান ও অন্যদের দিয়ে বাঙালি নিধন যজ্ঞ চালানোর জন্য "অপারেশন সার্চলাইট" পরিকল্পনা চুড়ান্ত করে অনুমোদন দিয়ে গেলেন। কিন্তু অপারেশন সার্চ লাইটের নৃশংসতার দেখার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো তার সফর সঙ্গী সহ রয়ে গেলেন।

পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি সৈনিক, ইপিআর ও অন্যান্যদের নিরস্ত্র করে আটক করতে থাকলো। অবস্থা বুঝে বাঙালি সৈনিক ও ইপিআর গণ অনেকে অস্ত্র নিয়ে কেহ কেহ জীবন বাঁচানোর জন্য খালি হাতে পালিয়ে এলেন। ২৫ মার্চ'৭১ রাত সাড়ে ১১টার পর টিক্কা খান মর্টাশেল, কামান ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে "অপারেশন সার্চ লাইট" শুরু করে। তারা একযোগে পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহরুল হক হল), ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবন আবাসিক অন্যান্য হল ও শাখারী বাজার সহ ঢাকার অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করে। ঢাকা সহ অন্যান্য শহরে গণ হত্যা শুরু করে। নিরীহ, ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। পাখির মত লোক হত্যা করে। বস্তি ও অন্যান্য স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসক বাঙালিদের উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিল। ২৬মার্চ'৭১ রাত ৮.০০ টায় করাচি থেকে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ প্রদান করেন। ঐ বেতার ভাষণে আওয়ামী লীগ কে নিষিদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু কে দেশদ্রোহী হিসাবে বিচারের ঘোষণা দিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন– মৃত্যুই রাষ্ট্রদোহীতার একমাত্র সাজা ...Sheik Mujib is a traitor and this time he and his party Awami league shall not go unpunished...আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা, ইপিআর, আনসার ও ছাত্র জনতা প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছিলেন। কসাই টিক্কা খান বলে ছিলেন– ম্যায়নে শেখ ছাবকা Indepdence করনা এলান আপনা কানসে শোনাহুয়া... arrest him রাত ১.১০টার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে প্রথমে ঢাকা সেনা নিবাসের অভ্যন্তরে আদমজী কলেজে রাখা হয়। সকালে ফ্লাগ স্টাফ হাউসে নিয়ে সারা দিন আটকে রাখা হয়। সন্ধ্যায় অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কযেক দিন পরে বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে কারাগারে বন্ধি করে রাখা হয়। ভুট্টো "অপারেশন সার্চ লাইট" দেখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। তিনি ২৫ শে মার্চে পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা দেখেন। তিনি ২৬ মার্চ সকালে সামরিক প্রহরায় তার সফর সঙ্গীদের সহ ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি করাচি বিমান বন্দরে পৌছে পাকিস্তানি হানাদার সৈনিকদের প্রশংসা করে ছিলেন। ৩ ডিসেম্বর'৭১ পাকিস্তান একযোগে ভারতীয় কয়েকটি বিমান ঘাটিতে আক্রমন করেছিলো। ৬ ডিসেম্বর'৭১ ভারত বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেয় এবং মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠন করে। যৌথ বাহিনী একযোগে পাকিস্তানি সৈন্যদের উপর আক্রমন করে। পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর'৭১ যৌথ বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পণ করলে ১৯/১২/৭১ তারিখে ভূট্টো ইয়াহিয়া খান এর কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা কেরে নেন। এই ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক প্রধান হন। পরবতী নির্বাচনে তিনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে রাখা হয়েছিল। ৭ সেপ্টম্বর'৭১ হতে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রহসন মূলক বিচারের মাধ্যমে পাকিস্তানি জান্তা ৪ ডিসেম্বর'৭১ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়। ৩ ডিসেম্বর'৭১ বাঙালিদের মুক্তি যুদ্ধকে বিশ্বে ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাটিতে আক্রমন করে। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে কয়েকটি শর্তের মধ্যে একটি। হলো- ভারত বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে দ্বিতীয় বাংলাদেশ যখন চাইবে ভারতীয় সৈন্য তখনই বাংলাদেশের থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। বাংলাদেশ সরকার যখন চাইবে তখনই ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশ ত্যাগ করবে। তখন ভারত পাকিস্তানের উপর পাল্টা আক্রমন করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভারতের সৈন্য যোগ দেয়। সে দিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পরিনত হয়। ৬ ডিসেম্বর'৭১ প্রথমে ভারত তাদের সংসদ অধিবেশনে বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতের জাতীয় সংসদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সংবাদের পর প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ভুটান বাংলাদেশ কে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়

তারপর ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেয়। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও আমাদের দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা বাঙালিদের মেধাশুন্য করতে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরী করে। আলবদর বাহিনী নেতৃত্বে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তালিকা ধরে ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে অমানবীয়- নির্যাতন করে হত্যা করে। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ কিছু বুদ্ধিজীবীর লাশ রায়ের বাজার বধ্যভূমি, মিরপুর বধ্যভূমি ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। ২৬ মার্চ'৭১ চট্টগ্রামের অগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে দুপুর ১.১০মি. এর পর জাতির পিতার স্বাধীনতা ঘোষনার বার্তাটি পাঠ করেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এম,এ হান্নান। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় কালুর ঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ইহার মধ্যে একটি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার বার্তা পাঠ করেছিলেনে তদানীন্তন মেজর জিয়াউর রহমান। তখন সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সারাদেশ কে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করলো। ৪ এপ্রিল'৭১ মো: নুরুল আমিন ও অধ্যাপক গোলাম আযম সহ ইসলামী দলগুলোর নেতারা ১২ জন টেক্কা খানের সাথে সাক্ষাত করেন। স্বাধীনতা বিরোধীরা শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য বাহিনী করে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যোগ দিল। জীবনের ভয়ে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও এ দেশের কিছু হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নিল। ১০ এপ্রিল'৭১ ভারতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত এম. এন .এ. ও. এম.পি.এদের নিয়ে গন পরিষদ করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করল। ১৭ এপ্রিল'৭১ কুষ্টিয়া জেলা মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবের পাড়া বৈদ্যনাথ তলার অম্রকাননে বাংলা দেশ সরকার শপথ গ্রহণ করল। বৈদ্যনাথ তলার নাম করণ করা হলো মুজিব নগর। মহান মুক্তিযুদ্ধ কী, কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে, কতদিনে দেশ স্বাধীন হবে, একটি প্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন সম্ভব কিনা। ভারত বহি বিশ্বের চাপে বাংলাদেশ কে সহযোগিতা করতে পারবে কী না ইত্যাদি বোঝার বয়স তখন আমার হয় নাই। আমি তখন রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ২৫ মার্চ রাতে " অপারেশন সার্চ লাইট" এর নৃশংসতা ও পরবর্তীতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণ হত্যা, লুণ্ঠন, জ্বালাও পোড়াও , নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধর্ষণ সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজের কথা সকলের আলোচনা ও স্থানীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ্যাড.জনাব মো: আব্দুর রহমান স্যারের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের আহ্বান ও অন্যান্য সব কথা শুনে জাতির ক্রান্তিকালে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন পণ অংশ গ্রহন করেছিলাম।

আমরা তিনটি হিট এন্ড রান কার্যক্রম করেছি। একটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করার জন্য ও পাকিস্তানি আর্মি বাহি ট্রেন আক্রমন করার জন্য এ্যাম্বুস করেছিলাম। আমরা বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ, বেলকুচি থানার কল্যানপুর ও শাহজাদপুর থানার ধীতপুর নামক স্থানে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছি। যুদ্ধ বিবরণ গুলো হলো:-

১. **বেলকুচি থানা অপারেশন :**

বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। এই থানা অপারেশনে নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার। ২৪ অক্টোবর'৭১ কমান্ডার স্যারের ও আরো ৩ জনের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও মুসলিমলীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমন করে ছিলাম। সন্ধ্যায় বানিয়া গাতি শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করে ছিলেন। কমান্ডার স্যার আমাদের গ্রুপ কে দুই গ্রুপে ভাগ করে দিয়ে ছিলেন। সিদ্ধান্ত ছিল কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় গ্রুপটি থানা আক্রমন করবে। অন্য গ্রুপটি রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতা মো: আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমন করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের

গ্রুপে থেকে থানা আক্রমন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলাম। রাত ৯ টায় বানিয়া গাতি শেল্টার থেকে যাত্রা করে ছিলাম। থানার কাছে গিয়ে দু গ্রুপ টার্গেটের উদ্দেশ্যে ভাগ হয়ে ছিলাম। রাত ১২টায় একযোগে আক্রমনের সিদ্ধান্ত। পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের গ্রুপ থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে ক্রোলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্ট্রি দেখে ফেলে ছিল। হুইসেল বাঁজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদের কে লক্ষ্য করে সেন্ট্রি গুলি করা শুরু করে ছিল। তাঁরপর আমাদের গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করে ছিলেন। তারপর সবাই একযোগে গুলি শুরু করে ছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ হয়ে ছিল। যুদ্ধটি ছিল ভয়াবহ যুদ্ধ। আমার মাথায় হেলমেট ছিল। দুইটি গুলি এসে আমার হেলমেটে লেগে ছিল। আমার ডান পাশে অবস্থান নিয়ে ছিলেন যুদ্ধের কমান্ডার। বিজয় আর না হয় মৃত্যু ছাড়া কোন পথ ছিল না। আমরা সবাই বৃষ্টির মত গুলি চালাচ্ছিলাম। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কমান্ডার স্যার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন-“দেবেশ মাথা তুলো না, গুলি চালিয়ে যাও”। আমাদের গুলির কাছে হেরে গিয়ে থানার পুলিশ ও রাজাকারেরা থানার পিছনদিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর যমুনা নদীতে থাকা একটি লঞ্চে আমাদের রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গিয়ে ছিল। থানার সেন্ট্রি গুলি করা বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করলো। তারপর আমরা সবাই থানার ভিতরে ঢুকে পড়ে ছিলাম। থানার মাল খানা থেকে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে ছিলাম। এই যুদ্ধে দু'জন রাজাকারকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে এসে ছিলাম। ভোর হয়ে গিয়েছিল। মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমন করা দলটিও এলো। মতিন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে অধিকাংশ বাড়ি ও দোকানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি করে রেখে ছিল। থানার আশেপাশের লোকজন দোকান ও বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। বিজয়ী হয়ে আমরা ভোরের দিকে কিছু সময় বিজয় উল্লাস করলাম। তারপর ধরে আনা রাজাকার দুই জন সহ আমরা বেলকুচি থানার একটি নিভৃত গ্রামে শেল্টার নিলাম। ঐ দিন বেলা ১১.০০ টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর থেকে বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা বেলকুচি থানায় এলো। তারা বেলকুচি থানার আশে পাশের কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে কয়েক জন যুবক কে ধরে এনে অত্যাচার করেছিল। বেল কুচি থানা অপারেশনের সময়ে আমরা ২ জন রাজাকার কে ধরে এনে ছিলাম। প্রথমত রাজাকার দুইজন কে আমাদের শেল্টারের একটি রুমে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার স্যারের অনুমতি নিযে তাদের রুমে গেলাম। আমি রুমে ঢুকে তাঁদের নাম ও ঠিকানা জানলাম। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দিন। আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি রাজাকার ২ জনের চোখের বাধঁন খুলে দিলাম। তারপর তাদের রাজাকার হওয়ার প্রেক্ষাপট জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা যা বললেন- তার মোটা মাটি অর্থ হলো- আমরা রাজাকার সম্পর্কে কিছু বুঝিনা। আমরা গরীব মানুষ। আমরা বিবাহিত। আমাদের পরিবারে বাবা, মা স্ত্রীও ছেলে মেয়ে আছে। আমরা রাজাকার হওয়াটা একটি চাকরি মনে করে রাজাকারে ভর্তি হয়েছি। আমরা কাউকে কোন প্রকার অত্যাচার করি নাই। আমরা কখনো পাকিস্তানি সৈন্যদের কে সাথে নিয়ে গিয়ে কোন বাড়ি লুটতরাজ করি নাই। কোন বাড়িতে আগুন দেই নাই। কোন মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি- চিনিয়ে দেই নাই। আমরা চাকরি করি, বেতন পাই। সেই টাকা দিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ করি। আপনি দয়া করে সবাই কে বলে আমাদের কে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা আর রাজাকারে ফিরে যাবো না”। তাদের দেখে ও তাঁদের কথা শুনে মায়া হলো। দুপুরে রাজাকার দুই জনকে সাথে নিয়ে সবাই এক সাথে বসে খেলাম। বিকালে কমান্ডার স্যার কে তাঁদের সাথে আলাপ চারিতার কথা বললাম। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। রাত ৯.০০ টার দিকে আবার রাজাকার দুই জন কে সাথে নিয়ে শেল্টারে বসে এক সাথে খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর শেল্টার পরিবর্তনের জন্য যাত্রা করলাম। চলার পথে কমান্ডার স্যার কে রাজাকার দুইজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানালাম। কমান্ডার জনাব এম, এ মান্নান স্যার ছিলেন

শিক্ষিত ও ভালো মানুষ। তিনি আমার অনুরোধে রাজাকার দুই জনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। স্যারের অনুমতি পেয়ে আমাদের গ্রুপের সবাইকে রাস্তায় দাড় করিয়ে রেখে আমি আর-আমাদের গ্রুপের সহযোদ্ধা দৌলতপুর গ্রামের মো: শামসুল হক রাজাকার দুই জন কে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলাম। সর্বশেষ বলে এলাম আপনারা সরাসরি বাড়িতে চলে যাবেন। আর থানায় ফিরে যাবেন না। আর রাজাকারে যাবেন না। দেশ অল্প দিনের মধ্যেই স্বাধীন হবে। বেলকুচি থানা অপারেশন যুদ্ধে আমাদের গ্রুপের সাথে ছিলেন কাজিপুরের জনাব মো: আমির হোসেন ভুলু এর দল সহ আরো বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল।

২. কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটে এ্যাম্বুস :

কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন ও জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে আমরা এ্যাম্বুস করেছিলাম। কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এই এ্যাম্বুসের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান। ৪ নভেম্বর'৭১ গ্রুপের ঝাঐল গ্রামের সিরাজগঞ্জের এম,এন, এ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভায়রা আওয়ামীলীগ নেতা জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ও জামতৈল স্টেশনের মাঝ পথে আমরা এ্যাম্বুস করেছিলাম। এই রাতের পাশওয়ার্ড ছিল ১. জবা ও ২. পলাশ। কমান্ডার স্যার-নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কারণ বশত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে সবাই একত্রিত হবো। আমার তামাই গ্রামের বাড়িতে। কমান্ডার স্যার ক্রোলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসে ছিলেন। গ্রুপ কমান্ডার স্যার ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ছিলেন। আমরা সবাই ধানক্ষেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। কামান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারী। টর্চ লাইট ও হ্যারিকেন হাতে রেল লাইনে পাকি মিলি শিয়া ও রাজাকারেরা টহল দিচ্ছিল। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছিল। মাইনটি পাকি হানাদারদের নজরে পড়ে ছিল। পাকি হানাদাররা হুইসেল দিয়ে রাজাকারদের লাইং পজিশনে রেডি থাকতে কমান্ড করলো। আমাদের দিকে টর্চ লাইট মেরে মেরে উর্দূতে বকাবকি করতে থাকলো। ইতিমধ্যে ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ গামী পাকি হানাদার বাহী একটি ট্রেন এলো। পাকি হানাদারেরা সিগন্যাল দিয়ে ষ্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিল। ট্রেনের পাকি হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমাদের কে খুঁজতে থাকলো। আমাদের মাইনটি ব্রাষ্ট করা সম্ভব হলো না। পাকি হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন। আমরা ক্রোলিং করে কিছু দূর পিছিয়ে এসে তামাই গ্রামে চলে এসে ছিলাম। পরের দিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুরের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামের অনেক বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং গ্রামের অনেককে ধরে নির্যাতন করেছিল। আমরা এ্যাম্বুস থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয় ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশ কিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছিল। এত বড় প্লাটুন এক শেল্টারে শেল্টার নেওয়া সমস্যা। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কে কমান্ডার করে আমাদের কয়েক জনের আর একটি গ্রুপ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কমান্ডার স্যার নির্দেশ দিয়ে বললেন- আজ থেকে আমাদের গ্রুপের ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী কে আমার দ্বিতীয় গ্রুপের গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মনোনীত করা হলো। দ্বিতীয় গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা গণ আমার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর কমান্ডানাধীন হয়ে কাজ করবেন। রবীন্দ্রনাথ বাগ্চীর গ্রুপের সদস্যরা হলেন শাহজাদপুর থানার অধিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ১. মো: বজলুল করিম দুলাল। ২. নজরুল ইসলাম ৩. রতন কুমার দাস ৪. দেবেশ চন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্যরা এবং চৌহালী থানার মো: নজরুল ইসলাম। আপনারা আমাদের মুল গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করে অবস্থান নিয়ে নিয়ে আমাদের মুল গ্রুপের কাছাকাছি থাকবেন। প্রয়োজনের সময়ে আমরা দুই গ্রুপ একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্য ক্যাম্প, রাজাকার ক্যাম্প আক্রমন ও থানা অপারেশন করবো। সিদ্ধান্ত নিয়ে এক যোগে হেঁটে হেঁটে আমরা এলাম কল্যানপুর নামক গ্রামে।

৩. কল্যাণপুর যুদ্ধঃ

কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান। বেলকুচি থানার কল্যাণপুর নামক গ্রামে একটি স্কুলে আশ্রয় নিলাম। ৫ নভেম্বর'৭১ গ্রামের কয়েক জন নেতৃ স্থানীয় মানুষ আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত নিদ্রাহীন থেকে ও হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার খেয়ে কমান্ডার স্যারের কমান্ডে আমরা প্রকাশ্যে পিটি, প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরিষ্কার করলাম। অস্ত্রে ফুলথ্রু মারলাম। কমান্ডার স্যারের কমান্ডে আমরা দুইজন করে করে ডিউটি করতে থাকলাম। অন্যান্যরা ঘুম বা বিশ্রামে থাকলাম। কল্যানপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারনা ছিল এই গ্রামে পাকি হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেন্ট্রিরত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমাদের কে ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাকি হানাদার মিলে শিয়া ও রাজাকার আসছে। বওড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যানপুরের দিকে আসতে ছিল। দুইজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আস ছিল। দূর থেকে অনুমান হলো এই দলে ৫ জন পাকিস্তানি মিলেশিয়া ও ৮ জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার স্যার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যারের নির্দেশ মত। কল্যানপুর রাস্তার ধারে বাংকারের মত বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশ ঝাড়ের সামনে দিয়ে চলা রাস্তা ধরে পাকিস্তানি মিলেশিয়া, রাজাকারেরা এবং পথ চিনানো লোক দুইজন আসছিল। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে কমান্ডার স্যার কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পজিশন নিল। ওরাও আমাদের কে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ছিল। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকলাম। জীবন মরণ ভয়াবহ যুদ্ধ। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশে পাশের গ্রাম সমূহে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদের সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে এসে ছিলেন। এক ঘণ্টার অধিক সময় ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ চলছিল। তারপর পাকি হানাদারেরা পিছিয়ে গিয়ে ছিল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করে ছিলাম। সাহায্য কারী বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে পরিচয় হলো। দেখা গেল জনাব মো: নজরুল ইসলাম ও মো: বাবর আলীর মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ সহ কয়েকটি গ্রুপ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এসেছে। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। বিকাল ৩.০০ টার দিকে এক ব্যক্তি দৌড়ে হাপাতে হাপাতে আমাদের কমান্ডার স্যারের কাছে এসে বললেন-"বেলকুচি থানা ও অন্যান্য যায়গা থেকে বেশ কিছু হানাদার সৈন্য ও রাজাকারেরা ভারী অস্ত্র নিয়ে আপনাদের কে আক্রমন করার জন্য আসছে। সংবাদটি পেয়ে কমান্ডার স্যার সবাই কে নিরাপদ স্থানে সড়ে পরার নিদের্শ দিলেন। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন হয়ে আমরা কয়েক জন হেঁটে পিড়ার চর,খাসিয়ার চর, ও অন্যান্য গ্রাম ঘুরে দৌলতপুর গ্রামের সহযোদ্ধা মোঃ শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিয়ে ছিলাম। পর দিন বেতকান্দি মিস্ত্রীবাড়ির ফাঁকা ভিটায় এসে কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম। মো: কোরপ আলী মোল্লা নামক এক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের সকালের খাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি তার বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমাদের কমান্ডার রাজি হলেন না। আমরা ফরিদ পাঙ্গাসী গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আলহাজ্ব মো: আবু তালেব মাষ্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। কয়েক দিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে শেল্টার নিয়ে থাকলাম। প্রতিদিন রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাসওয়ার্ড দিতেন। প্রতিদিন সকালে অস্ত্রে ফুল থ্রু মারা হতো ও তেল দেওয়া হতো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্য ক্যাম্প ও রাজাকার ক্যাম্প আক্রমন করার জন্য গ্রুপ করে করে রেকি করতাম।

৪. ধীতপুর যুদ্ধঃ

ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চী। ১২ডিসেম্বর'৭১ রাতে আমাদের শেল্টার ছিল সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্ত্তী, আখর হাজী ও অন্যান্যের বাড়িতে। ১৩ ডিসেম্বর'৭১ বেলা ১২.০০ টার দিকে সংবাদ পেলাম পাকি হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাকি হানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পাড়

হয়ে মালিপাড়া রাজাকার ক্যাম্পে এসে ছিল। মালিপাড়া ক্যাম্প থেকে রাস্তা চিনানোর জন্য দুই জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াপদা বাঁধ ধরে বেড়ার উদেশ্যে যাচ্ছিল। কৈজুরী থেকে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পিছু নিলাম। আমরা পাকি হানাদারদের অনুসরণ করছিলাম। আমাদের কমান্ডারের নির্দেশ ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের লোকজনদের আর ক্ষতি না করলে আমরা ওদেরকে কিছু বলব না। ওরা ক্ষুধার্ত। কৈজুরী গ্রামের একজনের মুলা ক্ষেত থেকে মুলা খাওয়ার চেষ্টা করলো। ওরা হয়তো জানতো না কাঁচা মুলা খাওয়া যায় না। ওয়াপদা বাঁধ ধরে ওরা অগ্রসর হতে লাগলো। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধী। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে ছিল। আমরা জাম্প করে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে পজিশন নিয়ে ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারেরা ওয়াপদা বাঁধের পূর্ব পার্শ্বে পজিশন নিয়ে ছিল। এক ঘণ্টার অধিক সময় ব্যাপি গুলি পাল্টা গুলি চলতে থাকলো। গুলির শব্দে শাহজাদপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও বেড়া থানার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করলো। আমরাও অন্ধকারে গুলি করা বন্ধ করে দিয়ে ছিলাম। সারারাত আমরা না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিল বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন। এই যুদ্ধে আমি থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালিয়েছি। আমার বাম পার্শ্বে অবস্থান ছিল আমার কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচীর। তিনি এলএমজি চালাচ্ছিলেন। আমার ডান পার্শ্বে অবস্থান পজিশন নিয়ে অস্ত্র চালাচ্ছিলেন কাদাই বাদলা গ্রামের মোঃ নজরুল ইসলাম, পুকুর পার গ্রামের রতন কুমার দাস ও অন্যান্যরা। আমাদের গ্রুপের ডান পার্শ্বে অবস্থান ছিল বেড়া থানার এস এম আমির হোসেন এর গ্রুপ ও অন্যান্য গ্রুপ। সারা রাত দুই জন রাজাকার মাঝে মধ্যে কাভারিং ফায়ার করছিল। আমরাও ওদের ফায়ারের জবাবে দুই একটি করে ফায়ার করছিলাম। ভোরের দিকে আমাদের কমান্ডার ও অন্যান্যরা রাজাকার দুই জন কে ঘিরে ধরে আত্মসমর্পন করিয়ে ছিল। রাজাকার দুই জন কে আত্মসমর্পন করানোর পর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল রাত ১২.০০ টার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদেরকে কভারিং ফায়ার চালানোর নির্দেশ দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেড়ার দিকে পালিয়ে গেছে। পরে জানা গেল। ঐ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেড়া নদীতে থাকা ভেড়া কোলা গ্রামের হলদারদের নৌকায় বেড়া নদী পাড় হয়ে নগর বাড়ি হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের দুই জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। ঐ দিন স্থানীয় দুজন পথচারী গোলাগুলির সময়ে গুলি লেগে মারা গিয়ে ওয়াপদা বাঁধের উপর পরে ছিলেন। আমাদের ও অন্যান্য গ্রুপের বেশ কয়েক জন আহত হয়ে ছিলেন। ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়ে ছিলাম। ঐ দিনই শাহজাদপুর ও অন্যান্য স্থানের মুক্তিযোদ্ধারা শাহজাদপুর ও বাঘাবাড়ী ঘাট থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতারিত করেছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ শাহজাদপুর থানা হানাদারমুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর' ৭১ একা নব্বই হাজারাধিক পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ

কে নিয়াজী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে(তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) বাংলাদেশে অবস্থান রত সকল পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে আমাদের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে।

তোমরা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়বে। আমরা চাই তোমরা উচ্চশিক্ষিত মানবীয় গুণসম্পন্ন দেশ প্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠো। এ দেশ তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়লে তোমরা সব জানতে পারবে। আমি তখন ছিলাম অষ্টম শ্রেনির ছাত্র। বিভিন্ন মাধ্যমে থেকে যা জানতে পেরেছি তাই তোমাদেরকে জানালাম। আমার অনুরোধ- "তোমরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটি জেনে নিও। নিজের কথা ও কাজে সৎ থেকো। মনে রেখো- আমরা রক্তে পাওয়া দেশ ও দেশের পতাকা তোমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা দেশ কে মায়ের মতো ভালোবাসবে। তোমরাই পারবে দেশ টাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করো। মনে রেখ নিজের কাজটা সততার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই সবচেয়ে বড় দেশ প্রেম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আত্ম বিশ্বাসী ও ধৈর্যশীল থেকো। দেশটা তোমার শেকড়। সেই শেকড়টাকে। তোমরা ভূলে যেও না। যে স্বপ্ন নিয়ে তিরিশ লক্ষ বাঙালি শহিদ হয়েছেন এবং দুই লক্ষাধিক মা বোন ধর্ষণ, নিপীড়ন সহ বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ কে হানাদার মুক্ত করেছি। তোমরা সেই সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। আমি যে ভাবে তৎকালীন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন পণ অংশ গ্রহন করে ছিলাম। তা তোমাদের কে জানাচ্ছি:- ১৯৭১ সালের ২৬মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জণ পর্যন্ত আমাদের দেশে সশস্ত্র মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। ২৪ এপ্রিল বিকালে বাঘাবাড়ী ঘাটে পাক বাহিনী আসে। তখন বাঘাবাড়ি ঘাটে ব্রিজ ছিল। ফেরিতে যান বাহন পাড়াপাড় করা হতো। ফেরী ছিল। ফেরিতে পাড়ে তৎকালীন সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও জনাব এ কে শামসুদ্দিন এর নেতৃত্বে আওয়ামী/ছাত্র লীগ নেতা কর্মী, ইপিআর, বাঙালি সৈনিক, আনসার ও অন্যান্যদের সহযোগিতা ব্যাংকার করে প্রতিরোধ যুদ্ধ করার প্রস্তুতি ছিল। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা বাঘা বাড়ি ঘাট দক্ষিণ পাড়ে এসে ২" মর্টার, মেশিনগান এবং ভারি আর্টিলারি ফায়ার ওপেন করে। বিকট শব্দ হয়। এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়। মর্টারের একটি শেল ডায়া গ্রামে এবং একটি নরিনা গ্রামে গিয়ে পড়ে। বিকট শব্দে এলাকার মানুষ আত্ম রক্ষাথে এদিক ঐদিক দোড়াতে থাকে। ২৫ এপ্রিল তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সৈন্য আসছে সংবাদ পেয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক গণ ডিফেন্স ছেড়ে দেন। বাঘাবাড়ি ঘাট প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা ঘাট পার হয়ে কামান দাগাতে দাগাতে চান্দাই কোনা পর্যন্ত যায় তারপর ফিরে আসে। শাহজাদপুর এসে দ্বারিয়াপুর বাজার, মনিরামপুর রাজারের বিভিন্ন হিন্দু ও আওয়ামীলীগ নেতাদের দোকান লুটতরাজ করায় এবং আগুন দিয়ে পুড়িদেয়।

২৫ এপ্রিল'৭১ পার্শ্ববর্তী উল্লাপাড়া থানার চড়িয়া গ্রামে গণহত্যা হলো। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য এই গণহত্যায় তিন শতাধিক নারী পুরুষ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইহার মধ্যে ১২৯ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল। নানা ভাবে নারী-পুরুষকে নির্যাতন নিপীড়ন করলো। ১৪ মে'৭১ স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতায় পাবনা জেলার ডেমরা,(বাউসগাড়ী, রুপসী) গ্রামে গণ হত্যা হয়। এই গণ হত্যায় আমার দুই দাদা (আমার বাবার পিশে মহাশয়) সহ

সাত শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু প্রান হারান। পোঁতা জিয়া গ্রামের মো: মাহতাব উদ্দীন সরকারের সহযোগিতায় শাহজাদপুরের গৌরকুন্ডু, প্রানগোপাল সাহা সহ অধিকাংশ হিন্দুদের বাড়ি ঘর ও দোকান লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উল্লাপাড়া থানার কানসোনা গ্রামের ঘোষ পাড়ায় গনহত্যা করলো। বাড়িঘর জালিয়ে দিল লুটপাট করালো। নারী-পুরুষকে নির্যাতন নিপীড়ন করলো। গ্রামের সাত জন নারী-পুরুষ ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যা করলো। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা খুব ভাল। আমাদের গ্রামের একজন মানুষও স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন না। জাতির ক্রান্তি কালে প্রতিবেশী মুসলমানেরা আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের আহবানের কথা জানতে পেরে আমি দেশের ক্রান্তি কালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে পকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশিয় দোসরদের বিরুদ্ধে গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশে যাত্রা করার দিন টি ছিল ২৩ জুলাই'৭১ (৬ শ্রাবণ ১৩৭৮) শুক্রবার। রাত ৯ টার দিকে আমি শাহজাদপুরের তদানীন্তন এম.পি.এ জনাব মো: আব্দুর রহমান স্যারের সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমরা এক সাথে ২২ জন রওনা হলাম। পাকিস্তানি হানাদারেরা ২৫ মার্চ'৭১ সাড়ে রাত ১১-০০ টার পর "অপারেশন সার্চলাইট" পরিকল্পনা করে বিশ্বের জখন্নতম জ্বালাও, পোড়াও ও হত্যা সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ শুরু করে ছিল। তখন পর্যায়ক্রমে সারাদেশের অধিকাংশ স্থান পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে চলে যায়। ২৭ মার্চ'৭১ ঢাকা ও অন্যান্য শহর থেকে আমাদের এলাকার চাকরি জীবিরা কোনো রকমে প্রান নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন। তাঁদের মুখ থেকে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসরদের মানবতা বিরোধী জঘন্যতম বর্বতার কথা শুনতে পারি। এ দেশীয় দোসরদের নেতৃত্বে সারা দেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করার জন্য পিচ কমিটি, রাজাকার, আল-বদর,আল-শামস ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে উঠেছে। সারাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা জ্বালাও,পোড়াও, লুটতরাজ, হত্যাা, গণহত্যা নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ করে চলেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রধান টার্গেট ছিল এদেশের হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা। পাকিস্তানি হানাদারেরা এদেশের হিন্দুদের খুঁজে বের করার জন্য মানুষকে জিজ্ঞেস করতো। মালাউন কাহা হ্যায়। পুরুষ কাউকে ধরলে বলতো-তুম মুসলিম হ্যায় ? কলেমা বাতাও। উলঙ্গ করে হিন্দু মুসলমান পরীক্ষা করতো। পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করেছে এদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা বিরোধীরা। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলে নিশ্চিত মারা যাব। এই ভেবে বাবা-মা কিছুতেই মুক্তিযুদ্ধে যেতে সম্মতি দিতেন না। তাই বাবা-মা ও পরিবারের অন্য কাউ কে না জানিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। রওনা হওয়ার আগে আমার লেখা পড়ার একটি পাতা ছিরে মাকে একটা চিরকুট লিখলাম। " মা, প্রনাম নিও, বাবাকে আমার প্রনাম দিও। বড় দাদা, মেজদাদা, ও বৌদিকে প্রনাম দিও। ছোট ভাই বোনকে স্নেহাশিষ দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না জন্য না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেন বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি। ইতি- তোমার ছেলে দেবেশ।"

যাবার সময়ে বাড়ির কাউকে জানিয়ে যাইনি। আমরা সুজানগর সাত বাড়িয়া হয়ে পদ্মা নদী পাড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার চিলমারি ইউনিয়নের খারিজাথাক গ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার অতিক্রম করলাম। আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। এম.পি.এ স্যার আমাদের কে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষনের ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের উদ্দেশে কলিকাতা চলে গেলেন। আমি প্রথমে ভর্তি হলাম কামারপাড়া ইয়ুথ

ক্যাম্পে। বয়সের স্বল্পতার কারণে প্রথম ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করতে চাইলেন না। মহা বিপদ, কোথা যবো, কি করব। উপায় খুঁজতে থাকলাম। বাবা মায়ের কাছে শুনে ছিলাম ওল্ড মালদহ তে আমাদের এক পিসে মহাশয় আছেন। তাঁর নাম বিশ্ব নাথ ভট্রাচার্য। তাঁর সঠিক ঠিকানা জানা নেই। ভর্তি হতে না পেরে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে যাত্রা করলাম ওল্ড মালদহের উদ্দেশে। কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে কিছু পথ বাসে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। তখন ভারতে বাংলাদেশীদের বাস ও ট্রেনে কোনো ভাড়া লাগতো না। তাঁরা আমাদের কে জয় বাংলার লোক বলতো। ভাড়া চাইতে এলে "জয় বাংলা" বললেই তাঁরা আর ভাড়া চাইতো না। আমি ট্রেনে টিকেট করি নাই। বার সই রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলীয়ে ওল্ড মালদহ গামি ট্রেনে উঠতে হবে। আমি স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছি। মোবাইল কোর্ট বসলো। স্টেশন থেকে আমাকে ধরে নিয়ে মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট এর রুমে নিয়ে গেল। সবাই কে নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করে করে জরিমানা করছে। আমাকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় বললাম "জয় বাংলা।" বুঝতে পারলেন আমি বাংলাদেশের লোক কোনো জরিমানা না করে ছেড়ে দিলেন। ট্রেনে উঠে ওল্ড মালদহ স্টেশনে নামলাম। অনেক খোঁজা খুজি করে পিসে মহাশয়ে বাড়ি বেড় করলাম। কয়েক দিন ভারতের ওল্ড মাহদহ, গাজল, শিলিগুড়ি ও জলপাই গুড়িতে বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে ঘুরলাম। আমার পিসে মহাশয়ের এক আত্মীয় ছিলেন শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন। তোমাকে আমি শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি করে দেই। তুমি ক্যাম্পে থেকে রেশন ও অন্যান্য তুলে খাবে আর থাকবে। কিন্তু আমি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে দেশে গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব প্রতিজ্ঞা করে ভারতে এসেছি। তাই আমার আত্মীয়ের কথায় শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি হতে রাজি হলাম না। কয়েক দিন গাজল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য জায়গা ঘুড়ে আবার ফিরে এলাম কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। বেড়া - সাঁথিয়ার এম এন এ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের সন্ধান পেলাম। তিনি ছিলেন মালঞ্চ(কুড়মাইল) মাইল ক্যাম্পের ইনচার্জ। আমাদের ৭ নম্বর সেক্টরের উপদেষ্টা। স্যারকে পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে পাঠালেন। আমি ও কামার পাড়া মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং কর্তৃক পক্ষকে অনুরোধ করলাম। ভর্তি কর্তৃপক্ষ আমার একটা ইন্টার ভিউ নিলেন। আমার দেশ প্রেম, সাহসী মনোভাব ও অন্যান্য শুনে ভর্তি করলেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে শুধু আমাদের ফলইং করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো ও পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, রতন কুমার দাস ও মো: নজরুল ইসলাম কে ট্রান্সফার করলো মালঞ্চ ক্যাম্পে, তারপর মালঞ্চ থেকে কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্পে। কুড়মাইল থেকে আমাদের কে আনা হলো পতিরাম ক্যাম্পে। পতিরাম ক্যাম্প থেকে এক যোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে ২০/২২ জন কে নিয়ে আসা হলো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষন শুরুর দিনে ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর প্রথমে ফলইন করিয়ে প্রশিক্ষনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন বিষয়ে বললেন। তারপর তিনি বললেন দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ডি এস ভিলন স্যার আসবেন। ঠিক দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষন প্রধান শিখ সেনা ডি এস ভিলন এলেন। তিনি আমাদের সকল কে উদ্দেশ্য করে বললেন-"... আপনাদের কে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশ মাতাকে হানাদার মুক্ত করতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা, প্রশিক্ষন ও অস্ত্র দিব। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্ম দাতা পিতা মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য

তাঁদের সন্তানদের কে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...। পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প টি ছিল ভারতের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় অবস্থিত। এই ক্যাম্প টি ছিল ৭ নং সেক্টর অধীন। পানিঘাটা স্থান টি ছিল চারি দিকে পাহাড়ের মধ্যে। কার্শিয়ান পাহাড় হইতে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বের বনাঞ্চল। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার সিট করে দিল। আমাদের প্রত্যেক কে একটা মগ, একটা প্লেট, দুই টা প্যান্ট, ২টা গেঞ্জি, একটি মশারি, ও বিছানা পত্র দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। আমাদের ২১ দিনের ট্রেনিং হলো। পানি ঘাটা হায়ার ট্রেনিং ক্যাম্পে তাবুর মধ্যে বসবাস। এক রাতে বাবা-মা ছোট বোন আর পরিবারের অন্যান্যদের কথা মনে পড়লো। আমি অঝরে কাঁদছি আর উচ্চারণ করছি- " চলো, চলো, ভাই মায়ের কাছে যাই। আমরা মায়ের প্রাণরে। আমরা বিনে দুখিনি মায়ে যে ধুলায়ে লুটায়ে কাঁদবে।" আমার কান্নায় তাবুর মধ্যের অন্যান্য সহযোদ্ধাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমাকে নানা ভাবে সান্তনা দিল। সহযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম আমাদের প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর কে ডেকে নিয়ে এলেন। হিন্দু বিহারী কো-অর্ডিনেটর ভারতীয় আর্মি। আমাকে হিন্দিতে নানা ভাবে বুঝালেন বললেন- " তুম বীর হায়, তুম কানু সান্যাল হায়, তুম সংশপ্তক হায়, নাহি কাঁদা...। আমাদের কে থ্রিনট থ্রি রাইফেল, এল, এম,জি, এস,এল,আর, ষ্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাস্ট এইড সহ অন্যান্য ট্রেনিং দিলেন। যুদ্ধের রণাঙ্গণের সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহীদ হলে করণীয় সর্ম্পকে এবং ফাষ্ট এইড সম্পর্কে ধারণা দিলেন। ভারতীয় কয়েক জন হিন্দু বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষন দিলেন। আমাদের কোম্পানীর প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ডি.এস. ভিলন। তাঁর এর কাছ থেকে জানলাম আমার এফ.এফ নং-৪৭৪২। আমার কোম্পানীর নাম ডেল্টা কোম্পানী ট্রেনিং শেষে আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, মোঃ নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাসসহ অনেক কে নিয়ে আসা হলো ৭ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুরে। তরঙ্গপুর এনে সিরাজগঞ্জ জেলার ১০ জনের সমন্বয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপের গ্রুপ লিডার হলেন বেলুকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এম.এ মান্নান। ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর উপজেলার জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। আমাদের কে তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, রেশনিং ও পকেট মানি দেওয়া হলো। আমার নামে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এক ম্যাগজিন গুলি, একটি হেলমেট ইস্যু করা হলো। অন্যান্য গোলা বারুদ, মাইন,গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ কমান্ডার স্যারের কাছে দিলেন। আমাদের কে রেশনিং ও পকেট মানি হিসাবে কিছু টাকা দেওয়া হলো। মৃত্যু যে হবেনা এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না। তাই আমি সনাতন ধর্মের রীতি অনুসারে যুদ্ধ জয়ের জন্য তরঙ্গপুর বাজার থেকে একখানা শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থ, মৃত্যু হলে লাশ জাতীয় পতাকা মোড়ায়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা ও সংবাদ ও উদ্দিপণা মূলক গান শোনার জন্য একটি ৪ ব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। তরঙ্গপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত বাসে এসে ট্রেনে উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংসন ষ্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো। ৫ সেপ্টেম্বর'৭১ অস্ত্র ও গোলবারুদ নিয়ে শিলিগুড়ী রেলওয়ে জংসন ষ্টেশনে বসে আসি। ষ্টেশনে পেসেঞ্জার বিহীন একটি ট্রেন দাড়িয়ে আছে। আমি বাতরুম করার জন্য ট্রেনের বাতরুমে ডুকলাম। বাতরুমে বসার আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াহুড়া করে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিলাম। প্লাটফর্মের উপর পড়ে গেলাম। আমার হাটুতে আঘাত পেলাম। তখন পকেটে কোন পরিচয় পত্র ছিল না। তখন মোবাইল চালু হয় নাই। ওখানে আমাকে কেহই চেনেন না। ষ্টেশনে পড়ে

মারা গেলে সাথীরাও কেহ আমাকে খুজেঁ পেতেন না। আমার লাশ কবর হতো কী দাহ হতো তা বলা যায় না। বাবা- মা ও পরিবারের অন্যান্যরা সারা জীবন আমার পথ প্রাণে চেয়ে থাকতেন। ট্রেন বদলীয়ে আসাম গামী ট্রেনে উঠলাম। ভারতীয়রা আমাদেরকে জয় বাংলার লোক বলতো। সরকারি বাস ও ট্রেনে টিকেট চাইতে এলে "জয় বাংলা" বললেই আর টিকেট বা ভাড়া চাইতো না। আসাম গামী ট্রেনে ধুবরী নামক ষ্টেশনে আমরা নামলাম। তারপর বাস যোগে মানিকার চর এলাম। রাত হয়ে যাবার কারণে রাতে মানিকার চর একটা বডিং এ থাকলাম। পরদিন সকালে নদী পার হয়ে এলাম রংপুর জেলার তদানীন্তন কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মুক্তাঞ্চলে স্থাপিত রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রৌমারী ক্যাম্পে আমরা স্নান খাওয়া দাওয়া করলাম। আমাদের কমান্ডার স্যার সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তাঞ্চল যমুনার চড়ে পৌঁছানোর জন্য একটি বড় ছই ওয়ালা নৌকা ভাড়া করলেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে রাতের খাবার খেয়ে রাত ৯:০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। ইহা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর'৭১। নৌকা বাহাদূরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে আসতে হয়। আমরা জানতে পেরে ছিলাম। বাহাদূরাবাদ ঘাট অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা। ঐ ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা ভয়ানক। তারা স্পীড বোট নিয়ে রাতে নদী টহল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার নির্দেশ দিলেন-"আপনারা সবাই নৌকার ডওরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকুন। পাকিস্তানি হানাদারেরা ধরতে এলে আমরা ধরা দিব না। যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে শহীদ হবো কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিব না"। রাত ২.০০ টার দিকে আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করতে থাকলাম। ওদের সার্চ লাইটের আলো এসে বার বার আমাদের নৌকাতে পড়ছিল। ভগবানের কৃপায়-ওরা আর স্পীড বোট নিয়ে ধরতে এলোনা। আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের সাথে চিড়া গুড় ছিল। ভোরে মাঝিরা এক কাইসা খেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। আমরা নীচে নেমে খেতের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করলাম। আমাদের সাথে থাকা চিড়া ও গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার খেলাম। তার পর নৌকা আবার ছাড়লো। তখন আমাদের নদী পথে আসার পথে অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে ছিল। বক্ষাপুত্র ও যমুনা নদী দিয়ে কাজিপুর থানার ও অন্যান্য বিভিন্ন ঝুঁকি পূর্ণ স্থানের সম্মুখ দিয়ে আমাদের নৌকা আসবে। দেখে শুনে খোঁজ নিয়ে থামিয়ে থামিয়ে ৪ দিন ভরে নৌকা এসে পৌছালো সিরাজগঞ্জ হানাদার মুক্তাঞ্চল যমুনার চরে। ইহা ছিল টাঙ্গাইল জেলার সিংগুলির চড়ের নিকটবর্তী। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল। মাঝিরা কোন রকমে ডালভাত অথবা খিচুরী রান্না করে আমাদের খাওয়াতো। এই ভাবে খেয়ে না খেয়ে চলছিলাম। পরদিন রাতে যমুনা নদীর এপাড়ে চলে এলাম। চলে এলাম বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকার এম.এন.এ জনাব মো: আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়িতে। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাই মো: রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করলেন। অক্টোবর'৭১ মাসের মাঝা মাঝির আগ পর্যন্ত আমাদের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা কম থাকায় রেকি করে আমাদের কমান্ডার স্যার সম্মূখ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন নি। আমরা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের দোসরদের আতঙ্কে রাখার জন্য গেরিলা কার্যক্রম "হিট এন্ড রান" চালাতাম। পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার ক্যাম্পের নিকট বর্তী গিয়ে ২/৪ টা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের আকাশ মুখি ফাঁকা গুলি ছুড়ে চলে আসতাম। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের দালাল, পীচ কমিটির লোক ও অন্যান্যরা আমাদের অস্তিস্তের কথা জানতে পারতো। আমরা দিনের বেলা স্কুলে বা কারো বাড়িতে

আত্মগোপন করে থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ছিল দুইটি পক্ষ। একটি স্বাধীনতার পক্ষে। অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। স্বাধীনতার বিপক্ষের পীচ কমিটির সদস্য,রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্যরা। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদের তথ্য দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ,চাঁদাবাজি,ধর্ষণ, নিপীড়ন, হত্যা, গণহত্যা ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজ করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল ওদের বড় টার্গেট। হিন্দু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যেত। নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা করতো। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা ও পাকিস্তানি হানাদার পক্ষ ত্যাগ করানোর জন্য ও তাদের সহযোগিতা না করার জন্য বিশেষ ভাবে অত্যাচারী পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করতো। গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজে সরাসরি জড়িত কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে ধরতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়াডে বিচার করার পরিকল্পনা ছিল। যে কারণে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে সাহসী একজন কে জল্লাদ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। আমাদের গ্রুপের জল্লাদ হিসেবে মনোনীত ছিলেন দৌলতপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মো: শামসুল হক। আমরা এমন কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারি নাই। আমাদের গ্রুপের নীতি ছিল- “আমরা আমাদের দেশী কোনো ভাই কে হত্যা করব না। বুঝিয়ে তাদের কে স্বাধীনতার পক্ষে আনবো” যে কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমরা কোন স্বাধীনতা বিরোধীকে ধরি নাই, অত্যাচার বা হত্যা করি নাই। আমরা নিজেরা বা তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার চেষ্টা করতাম। হাতে অস্ত্র থাকা শর্তেও আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে থাকতাম। যে কোন সময় পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের আক্রমন করতে পারে। আমাদের থাকা খাবার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা আজ এ শেল্টারে কাল সে শেল্টারে থাকতাম। কোন কোন দিন শেল্টারের অভাবে সারারাত চিড়া গুড় খেয়ে রাত্রি জেগে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হতো। গায়ে দেওয়ার লেপ কাথা ছিল না। মশার কামর থেকে রক্ষার জন্য মশারী ছিল না। অন্যান্য কি যে অমানবীয় কষ্ট। আমাদের শেল্টার পালা ক্রমে আমরা দু'জন করে করে পাহাড়া দিতাম। প্রতি রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাশওয়ার্ড দিতেন। স্থান পরিবর্তনের পর কমান্ডার স্যার মাঝে মাঝে কোনো কারণে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, আমরা কোথায় একত্রিত হবো তা নিদিষ্ট করে দিতেন। সাধারণত কোন শেল্টারে আমরা এক রাতের বেশী থাকতাম না। সাধারণত প্রতিরাতে শেল্টার পরিবর্তন করতাম। আমরা রাতে বিভিন্ন রাজাকারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বুঝাতাম। সকালে আমরা অস্ত্রে ফুল থ্রু মারতাম, পরিস্কার করতাম ও অস্ত্রে তেল দিতাম। তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তবুও স্বাধীনতা বিরোধীদের ভয়ে অনেকে আমাদের কে শেল্টার বা খাবার দিতে সাহস পেতেন না। কারণ অধিকাংশ গ্রামেই ছিল পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকার। তারা খোঁজ জানলে পার্শ্ববর্তী আর্মি বা রাজাকার ক্যাম্পে সংবাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিবে, বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে হত্যা করবে ও অত্যাচার চালাবে এই ছিল তাদের ভয়। আমাদের সাথে সব সময় চিড়া গুড় থাকতো। স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ায়ে আমাদের সাথে নিলাম। রাজাকারদের আলটিমেটামে গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের বাড়িঘর সব কিছু গ্রামের মো: হোসেন আলীর তত্ত্বাবধানে রেখে গোটা পরিবার বাড়িঘর সবফেলে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আসামের মানিকার চড় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী পাগল প্রায় হয়ে গিয়ে

ছিলেন। বাবা-মা মানিকার চর শরণার্থী ক্যাম্প থেকে সকালের খাবার খেয়ে প্রায়ই মানিকার চর - রৌমারী নদীর ঘাটে বসে থাকতেন। কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা এসে ঘাটে ভিড়লে বাবা আমার নাম ধরে ধরে ডাকতেন। বলতেন- "দেবেশ এসেছিস, বাবা এসেছিস...।" আমি বাড়ি থেকে চলে আসার পর মা আর দুধ পান করেন নাই। মা বলেছিলেন–" দেবেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আর দুধ খাবো না। আমি দুধ খুব ভালোবাসতাম। প্রতিদিন রাতে খাবার শেষে সকালে খাবার জন্য মা কড়াইতে পাটাড়ি দিয়ে জ্বাল দেওয়া দুধ অবশিষ্ট রাখতেন। ভোরে উঠে আমি কড়াই চেছে দুধ খেতাম। যে কারণে আমি যুদ্ধে যাওয়ার পর মা আর দুখ খান নাই। কোথায় ও আক্রমণের পূর্বে আমরা রেকী করে দেখতাম। তারপর আক্রমন করতাম। আদের গ্রুপ ৩টি "হিট এন্ড রান" ১টি পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এ্যাম্বুস ও ৩টি ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছি। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ শাহজাদপুর হানাদার মুক্ত হয়। রাজাকারেরা শাহজাদপুরের যে গিরি ধারী কুন্ডু (গিরি কুন্ডু) এর মেয়ে মনোরমা কুন্ডু (মনো) কে ধরে নিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করে ছিল সে বাড়িতে ফিরে আসে। সারা জীবন হাজারো চেষ্টা করেও তার বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে পারেনি। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে রতন কান্দি হাট ভরা লোকের মধ্য থেকে ভৈরব পাড়ার নারায়াণ চন্দ্র সরকার কে অপরিচিত অস্ত্র ধারীরা এসে ধরলো। আমাদের গ্রামের কয়েক জন মুসলমান তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য অস্ত্র ধারীদের অনেক অনুনয় বিনয় করলো। কিন্তু অস্ত্র ধারীরা হয়তো বা হত্যার চুক্তিতে এসেছিল। তাই তারা নারায়ণ চন্দ্র সরকার কে ছাড়লো না। ধরে নিয়ে নির্যাতন ও গুলি করে হত্যা করেছে। তাঁর লাশ পাওয়া গিয়াছিল দরগাহ পাড়ার চরে। উল্লাপাড়ার চড়িয়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যান্য স্থানে গণ হত্যা হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ শাহজাদপুর উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। পীচ কমিটির সদস্য, রাজাকার ও অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশ বিদেশে পালিয়ে যায়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীরা ছাড়া অন্যান্য জন সাধারণেরও বিশেষ অবদান ছিল। শাহজাদপুরে মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন গড়ে উঠে। জনাব মো: আব্দুল বাকি মীর্জাকে শাহজাদপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন আমাদের জামিরতা হাই স্কুল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প সহ শাহজাদপুর থানার সকল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের পরিচালনা ব্যয় ভার বহন করেন। পাকিস্তানি হানাদার সৈণ্যরা ১৬ ডিসেম্বর'৭১ আত্মসমর্পন করে। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের আত্মসমর্পনের পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, ভারত, ভুটান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সরকারের চাপে ৮ জানুয়ারী'৭২ পাকিস্তান সরকার প্রধান ভুট্টো জাতির পিতা কে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্ত হয়ে বিশেষ বিমান যোগে লন্ডন আসেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন ও স্বাগত জানান। ব্রিটিশে অবস্থান কারী প্রবাসি বাঙালিরা তাঁকে সংবর্ধণা দিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিজয়ী বাঙালিদের জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করে ছিলেন। সেই বিমান যোগে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসার পথে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু প্রতিবশী রাষ্ট্র ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রনে কয়েক ঘন্টার জন্য দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। দিল্লিতে বাঙালিদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগত জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। জাতির পিতাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়। তিনি দিল্লির এক বিশাল জন সভায় বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। সভা শেষে ঐ দিনই ১০ জানুয়ারী'৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন। ১১ জানুয়ারী একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১২ জানুয়ারী জাতির পিতা প্রথমে রাষ্ট্রপতি

হিসেবে এবং পরে রাষ্ট্রপতি পদের ইস্তেফা দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু করে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। জাতির পিতা আমাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারী'৭২ রবিবার সিরাজগঞ্জ সদরস্থ ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় অস্থায়ী অস্ত্র জমা নেওয়া ক্যাম্পে লেঃ সাইফুল্লাহ স্যারের কাছে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করে দুই সহোদর ভাই বিজয়ীর বেশে আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলাম। সরকার থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় মিলিশিয়া ক্যাম্প করা হলো। আমরা দুই ভাই মিলিশিয়াতে যোগ দিলাম না। কয়েক দিন পর সিরাজগঞ্জ এস.ডি.ও অফিস থেকে আমাকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মুক্তি বাহিনী প্রধান জেনারেল এম.এ জি ওসমানী স্বাক্ষরিত একটি সনদ পত্র, একটি সাদা কম্বল ও বকেয়া রেশনিং ও পকেট এ্যালাউন্সের ১১০/- টাকা দিলেন। আমি বাড়িতে এসে আমার রতন কান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা বাবু দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল এম.কম.এম.এড, মহাশয় এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণীর অটোপাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখা-পড়া শুরু করলাম। আমি জনাব এম.এ মান্নান স্যারের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের এক জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমরা তিনটি হিট এন্ড রান ও ২টি রাজাকারদের ধরে আনার জন্য কার্যক্রম করেছি। একটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করার জন্য এ্যাম্বুস করেছি। আমরা বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ, কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন রাজাকার ক্যাম্প ও ট্রেন পথে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এ্যাম্বুস, বেলকুচি থানার (বর্তমান উপজেলা) কল্যানপুর ও শাহজাদপুর থানার (বর্তমানে উপজেলা) ধীতপুর নামক স্থানে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছি। তোমরা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়বে। আমরা চাই তোমরা উচ্চশিক্ষিত মানবীয় গুণসম্পন্ন দেশ প্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠো। এ দেশ তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়লে তোমরা সব জানতে পারবে। আমার অনুরোধ - "তোমরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটি জেনে নিও। নিজের কথা ও কাজে সৎ থেকো। মনে রেখো- আমরা রক্তে পাওয়া দেশ ও দেশের পতাকা তোমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা দেশ কে মায়ের মতো ভালোবাসো। তোমরাই পারবে দেশ টাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করো। মনে রেখ নিজের কাজটা সততার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই সবচেয়ে বড় দেশে প্রেম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আত্ম বিশ্বাসী ও ধৈর্যশীল থেকো। দেশটা তোমার শেকড়। সেই শেকড়টাকে। তোমরা ভূলে যেও না। আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ কে হানাদার মুক্ত করেছি। তোমরা সেই সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

ইতি,

তোমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল ০৭.০১.২০২৬. **দেবেশ চন্দ্র সান্যাল, গ্রামও ডাকঘর-রতনকান্দি, উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।**

মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি : দেবেশ চন্দ্র সান্যাল, পিতাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল,মাতাঃ নিলীমা সান্যাল, গ্রাম ও ডাকঘর : রতন কান্দি, ইউনিয়ন : হাবিবুল্লাহনগর, উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ। বাংলাদেশ। গেজেট নং- বে-সামরিক সিরাজগঞ্জ-১৬৭৯। ভারতীয় প্রশিক্ষণ - এফ.এফ. নং-৪৭৪২। সমন্বিত তালিকা জেলা ভিত্তিক -১৪১১, উপজেলাভিত্তিক-১৫৮ মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি - ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম, ডিজিটাল সনদ ও পরিচয় পত্র নং- ০১৮৮০০০১৪১১।